‘খোয়াব’ পুড়ে যাওয়ার পরও তাদের চৈতন্য ফেরেনি

আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী

একুশে আগস্টের এতো বড় ঘটনা, যে ঘটনায় সারা বিশ্ব স্তম্ভিত হয়েছে এবং বিশ্ব নেতৃবৃন্দ প্রতিবাদ ও নিন্দা জানিয়েছেন। তাতেও জোট সরকারের টনক নড়েনি। কথায় বলে চোরের মায়ের বড় গলা। খালেদা-নিজামী সরকারের সবচাইতে বড় সাফল্য, গলাবাজিতে তাদের সঙ্গে কেউ পারে না। তাছাড়া সরকার পরিচালনায় লাজলজ্জারও কোনো বালাই নেই।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনগুলোর শান্তিপূর্ণ সমাবেশ ও মিছিলের উপর আবার হামলা চালানো হয়েছে। চেষ্টা হয়েছে শিক্ষকদেরও মার দেওয়ার। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি আরেফিন সিদ্দিকের বিশ্ববিদ্যালয় ভবনের অফিস কক্ষে ঢুকে কক্ষটি তছনছ করা হয়েছে। ছাত্র সংগঠনগুলোর অপরাধ, তারা ২১ আগস্টের নারকীয় ঘটনার শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ জানাতে চেয়েছিল। এটাই হচ্ছে ৬টি ছাত্র সংগঠনের অপরাধ। সিপিবি ও বাসদের ছাত্র সংগঠন যথাক্রমে ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্রফ্রন্ট সমদূরত্বের রাজনীতির গুরুবাক্য অনুসরণ করে মধুর ক্যান্টিনে নিষ্ক্রিয়ভাবে বসে থেকেও ছাত্রদলের ‘তারেক ব্রিগেডের’ ধাওয়া থেকে রক্ষা পায়নি।

২১ আগস্ট তারিখে দেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী এবং বর্তমানে বিরোধী দলের নেত্রী শেখ হাসিনার জীবনের উপর যে বর্বর হামলা হয়েছে, তাতে হাসিনা অল্পের জন্য বেঁচে গেলেও আইভি রহমানসহ অসংখ্য নরনারী হতাহত হয়েছেন। আওয়ামী লীগের অর্ধডজনের মতো আহত নেতাকে চিকিৎসার জন্য বিদেশে যেতে হয়েছে। এই অবস্থায় ক্ষমতাসীন জোট সরকারের উচিত ছিল নিজেরাই প্রথমে এগিয়ে এসে এই নৃশংস ঘটনার নিন্দা করা এবং দেশের মানুষকে গণতান্ত্রিক পন্থায় শোক, ক্ষোভ ও প্রতিবাদ জানানোর কাজে সহায়তা দেওয়া। সতেরো দিন (১৯৬৫) পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ করার পর ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী শত্রুপক্ষের সঙ্গে শান্তি বৈঠক করার জন্য তাসখন্দে গিয়ে আকস্মিকভাবে মারা গেলে তার কফিনটি নিজের কাঁধে বহন করেছিলেন পাকিস্তানের তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট জেনারেল আইয়ুব। আওয়ামী লীগের অন্যতম নেত্রী আইভি রহমানের মর্মান্তিক মৃত্যুর পর প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার তো উচিত ছিল গ্রেনেড হামলায় অসুস্থ শেখ হাসিনার (তাঁর কানের চিকিৎসা এখনো চলছে) সঙ্গে বৈঠক করার চেষ্টার প্রহসন না করে আইভি রহমানের জানাজায় গিয়ে হাজির হওয়া। তিনি তা করেননি; বরং এতো বড় নিষ্ঠুর ঘটনার দায়িত্ব আওয়ামী লীগের কাঁধে চাপিয়ে তার দল ও দলের জয়ঢাকগুলোকে প্রচারযুদ্ধে নামিয়েছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা ২১ আগস্টের পৈশাচিকতারই প্রতিবাদ ও নিন্দা জানাতে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মিছিল বের করেছিল। এটা তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার। একুশের যে ঘটনার দায়িত্ব জোট সরকার স্বীকার করেন না, সেই ঘটনায় শান্তিপূর্ণভাবে শোক প্রকাশ ও প্রতিবাদ জানানোর কাজে তারা পুলিশ ও দলীয় গুণ্ডা দিয়ে বাধা দেন কেন? সরকারের এই কাজে দেশবাসীর মনে এই সন্দেহই জাগতে পারে যে, তাহলে একুশের কালপ্রিটগুলো কি এই সরকারের মধ্যে রয়েছে?

১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু হত্যা ও জেল হত্যার ঘটনা যখন ঘটে, তখন বিএনপির জন্ম হয়নি; খালেদা জিয়া রাজনীতিতে নামেননি। অর্থাৎ ১৯৭৫ সালের আগস্ট ও নভেম্বরের হত্যাকাণ্ডে তাদের যোগসাজশ থাকার কথা নয়। তাহলে বর্তমান বিএনপি সরকার কেন সেই দুই হত্যাকাণ্ডের নায়কদের প্রোটেকসন দেয়ার জন্য আদাজল খেয়ে লেগেছে এবং তাদের আমলে বঙ্গবন্ধুর হত্যা মামলার শুনানী গ্রহণে একাধিক বিচারপতি বিব্রতবোধ করেন?

বঙ্গবন্ধু তো বিএনপি বা খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী অথবা শত্রু ছিলেন না। এই প্রতিদ্বন্দ্বী বা শত্রু হতে পারেন শেখ হাসিনা। সুতরাং খালেদা জিয়া ক্ষমতায় এলে তার ক্যাডারেরা হাসিনার ছবি ভাংচুর করলে তার একটা অর্থ বোঝা যায়। কিন্তু ম্যাডাম ক্ষমতায় বসলেই তার দলীয় ক্যাডারেরা বঙ্গবন্ধুর ছবি ভাংচুর শুরু করে, তার সরকার ইতিহাস থেকে বঙ্গবন্ধুর নাম নিশানা মুছে ফেলতে চায়, তার কারণটা কি? বিএনপির জন্ম এবং খালেদা জিয়ার রাজনীতিতে নামার বহু আগে বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় নেতাদের হত্যা করা হয়। সেই হত্যাকাণ্ডের লেগাসি কেন বহন করছে বর্তমান বিএনপি? যুক্তিশাস্ত্রের সূত্র অনুসারে তাতে কী প্রমাণিত হয়?

একুশে আগস্টের এতো বড় ঘটনা, যে ঘটনায় সারা বিশ্ব স্তম্ভিত হয়েছে এবং বিশ্ব নেতৃবৃন্দ প্রতিবাদ ও নিন্দা জানিয়েছেন। তাতেও জোট সরকারের টনক নড়েনি। কথায় বলে চোরের মায়ের বড় গলা। খালেদা-নিজামী সরকারের সবচাইতে বড় সাফল্য, গলাবাজিতে তাদের

সঙ্গে কেউ পারে না। তাছাড়া সরকার পরিচালনায় লাজলজ্জারও কোনো বালাই নেই। যে সন্ত্রাস দমনে (ডন কুইকজোটের মতো কল্পিত শত্রু দমনে) তারা হাওয়ায় গদা ঘোরাচ্ছেন, সেই সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ ছাত্রসমাজ শান্তিপূর্ণ পন্থায় মিটিং মিছিল করলে দলীয় সন্ত্রাসী দিয়েই তাদের লাঠিপেটা করেন। এতে যে সন্ত্রাস দমন হয় না, সন্ত্রাসীদেরই মদদ দেওয়া হয় এই সত্যটা রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের হর্তাকর্তারা জানেন না তা নয়।

তবে বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারির ভাষা আন্দোলন দমন করার জন্য তৎকালীন পাকিস্তান (পূর্ব) সরকার যে কৌশল গ্রহণ করেছিল, তার সঙ্গে ২০০৪ সালের ২১ আগস্টের বীভৎস গ্রেনেড হামলার ঘটনা ধামাচাপা দেওয়া এবং গণঅসন্তোষ দমন করার জন্য বর্তমান জোট সরকারের অনুসৃত নীতি পুরোপুরি অভিন্ন। বায়ান্ন সালের একুশ তারিখে ভাষা আন্দোলনের মিছিলে বিনা প্রোডোকেশনে গুলি চালিয়ে বরকত, সালামদের হত্যা করার পর নুরুল আমিন সরকার ঘোষণা করেছিল এটা সারভারসিভ এলিমেন্টদের (তখন সন্ত্রাসী কথাটা চালু হয়নি) কাজ। তারা "শিশুরাষ্ট্র পাকিস্তানের শত্রু" এবং "ভারতের চর"। ২৪ ফেব্রুয়ারি (৫২) রাতে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিন এক বেতার ভাষণে বলেছিলেন, "নারায়ণগঞ্জে ভাষার দাবিতে যে মিছিল হয়েছে, তাতে ভারত থেকে আগত ধুতি পরা হিন্দুদের দেখা গেছে এবং তারা জয় হিন্দ্ শ্লোগান দিয়েছে।" নুরুল আমিনের পুলিশ ওই সময় নারায়ণগঞ্জের মর্গান গার্লস স্কুলে হেডমিস্ট্রেসকে গ্রেফতার করার পর ছাত্রীদের উপর যে অত্যাচার চালিয়েছিল, তার সঙ্গে খালেদা জিয়ার পুলিশের শামসুন্নাহার হলে ঢুকে ছাত্রী নির্যাতনের ঘটনার অবিশ্বাস্য মিল দেখা যায়।

বায়ান্ন সালে শহীদ মিনারটি নির্মিত হওয়ার পর প্রথম পুলিশ ও মিলিটারি দিয়ে ভাঙ্গা হয় এবং পরে মুসলিম লীগ সরকারের পেটোয়া গুণ্ডাদের দ্বারা তিনবার ধ্বংস করা হয়। যতোবার শহীদ মিনারটি ভাঙ্গা হয়েছে, ততোবার মেডিক্যাল কলেজের ছাত্ররা সেটি গভীর রাতে পুনর্নির্মাণ করেছে। আমার সন্দেহ নেই চলতি বছরের একুশে আগস্ট তারিখে ঢাকার বঙ্গবন্ধু এভেনিউর যে স্থানে মিনি জালিয়ানওয়ালাবাগ সৃষ্টি করা হয়েছে, সেখানে আজ হোক কাল হোক একটি দ্বিতীয় শহীদ মিনার গড়ে উঠবে, মিনার সংলগ্ন একটি চত্বর তৈরি করে তার নাম রাখা হবে আইভি চত্বর। ওই চত্বরে প্রতিবছর একুশে আগস্ট তারিখে গ্রেনেড হামলায় নিহতদের শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করা হবে এবং বিএনপি-জামায়াত জোটের বিরুদ্ধে ধিক্কার ধ্বনি উত্থিত হবে চিরকাল ধরে। এখন এই ঘটনায় যে অসংখ্য আহত ও পঙ্গু হাসপাতালে অথবা ঘরে শুয়ে কাতরাচ্ছেন, তাদের এই কাতরানি থেকেই একদিন বজ্রধ্বনি জন্ম নেবে। যে শাস্তি ওরা এখন এড়াতে পারবে ভাবছে, সেই শাস্তি ইতিহাস তাদের জন্য তৈরি করে চলেছে। এরশাদের আল্লাওয়ালা ভবনের ধ্বংস দেখে এদের শিক্ষা হয়নি। তারেক রহমানের বিজনেস পার্টনার গিয়াসুদ্দীন মামুনের রাজপ্রাসাদ 'খোয়াব' পুড়ে যাওয়ায় এদের চৈতন্য হয়নি। সম্ভবত হাওয়া ভবনের ধ্বংসস্তূপের উপরেই বাংলার মানুষ একদিন নতুন ইতিহাস তৈরি করবে।

গুণ্ডা দিয়ে, সশস্ত্র ক্যাডারের সাহায্যে কখনো দেশ শাসন করা যায় না; ক্ষমতায় স্থায়ী হওয়া যায় না। যদি যেতো তাহলে পঞ্চাশের দশকে নুরুল আমিন মুসলিম লীগের গুণ্ডাদের সাহায্যে ক্ষমতায় স্থায়ী হতে পারতেন। মোনায়েম খানের 'পাঁচপাত্তু' এখন কই, যে সাপ গলায় ঝুলিয়ে সলিমুল্লাহ হলে রাজত্ব চালাতো? বর্তমান শিক্ষামন্ত্রীর বাবা, মোনায়েম খানের চামচা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন কুখ্যাত ভাইস চ্যান্সেলর ড. ওসমান গনি যাকে প্রোটেকসন দিতো? কোথায় স্বৈরাচারী এরশাদের কথিত তার "একমাত্র ছোট ভাই" সন্ত্রাসী গুণ্ডা আজম খান? যে আওয়ামী লীগের এক প্রবীণ নেতাকে প্রকাশ্যে হত্যা করার পর অভিযুক্ত হয়ে আদালতে এসে তার সঙ্গীদের সাহায্যে আদালতে ভাংচুর করেছে? সেদিনও পুলিশ বাহিনী এরশাদের হয়ে আজমের আদালত-অবমাননা এবং আদালতের ভেতরেই সন্ত্রাস ঘটানোর নির্বিকার দর্শকের ভূমিকায় অভিনয় করেছে। সেই বলদর্পী আজম এখন হয় জেলে নয় নিখোঁজ। এরশাদও তার নাম আর মুখে আনেন না।

ইতিহাস থেকে কেউ শিক্ষা নেয় না; বিএনপি-জামায়াত সরকারও নেয়নি। ফলে অতীতের স্বৈরাচারী সরকারগুলোর মতো তারাও দেশে গুণ্ডাপাণ্ডা, দলীয় ক্যাডার ও সন্ত্রাসী দ্বারা রেইন অব টেরোর বা ভয়ের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করে চিরকাল ক্ষমতায় থাকায় স্বপ্ন দেখছে। অতীতের পাঁচপাত্তু ও আজম খানের মতো এখন লাল্টু, পিন্টু, ইলিয়াস আলীদের দ্বারা গণতান্ত্রিক দাবি আদায়ের আন্দোলন থেকে গণসমাজ ও ছাত্র সমাজকে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা চলছে। এই গুণ্ডাপাণ্ডাদের সহযোগী হয় পুলিশ। লাঠি, বল্লম হাতে ছাত্রদলের ক্যাডার ও গুণ্ডারা তাদের মধ্যে ছাত্র নামধারী বহু সন্ত্রাসী আছে। সুশীল ছাত্র সমাজের মাথা ফাটায় আর তাদের সহযোগী পুলিশ নির্মমভাবে পিটিয়ে ছাত্র জনতার মিছিল ভাঙে এবং তার গতিরোধ করে।

গত ১১ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতে দেখা গেছে। জোট সরকার সন্ত্রাস ও বর্বরতা দ্বারা গণআন্দোলন, ছাত্র আন্দোলন দমনের যে চেষ্টা করছে, তার পেছনে একটি থিয়োরি আছে। এই থিয়োরিটির নাম 'সালাজার থিয়োরি।' পর্তুগালের এক সময়ের স্বৈরশাসক সালাজার এই তত্ত্বটি প্রচার করেছিলেন যে, পুলিশ ও মিলিটারির দ্বারা গণনির্যাতন চালানোর পাশাপাশি ক্ষমতাসীন ফ্যাসিবাদীদের দলের সশস্ত্র ক্যাডারদের দ্বারা (হিটলারের ছিল ব্রাউন শার্ট, মুসোলিনীর ছিল ব্লাক শার্ট, মোনায়েম খানের ছিল এনএসএফ) রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে এমন মার দিতে হবে যে, তাতে তারা ভয় পেয়ে দীর্ঘকালের জন্য নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে আর মাথা তুলতে সাহস পাবে না। তাদের মধ্যে এই ভয় কাটতে না কাটতেই আবার যে কোন অছিলায় প্রচণ্ড মার দিতে হবে। সরকারের এই শক্তি ও সন্ত্রাসের সামনে তখন শত্রুমিত্র কেউ আর মাথা তুলবে না। এই নির্বিচার ডাণ্ডাবাজির পাশাপাশি রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডও চালাতে হবে। সালাজারের এই মেথোড অবশ্য তাকেও শেষ পর্যন্ত রক্ষা করেনি।

২০০১ সালের অক্টোবর নির্বাচনের পর ক্ষমতাসীন হয়ে খালেদা-নিজামী সরকার অবশ্য এই সালাজার মেথোড দ্বারাই দেশ শাসন করছে। ড. বদরুদ্দোজা চৌধুরী বিএনপি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়ে বিকল্প ধারা নামে দল গঠনের পর বিএনপির ৩০/৪০ জন সংসদ সদস্য যে নতুন দলে যোগ দিতে উদ্যোগী হয়েছিলেন সে কথা এখন বাজারে ওপেন সিক্রেট। পুলিশ ও সশস্ত্র ক্যাডার দিয়ে বি চৌধুরীকে ধাওয়া করে রেল লাইন ধরে দৌড়াতে বাধ্য করে এবং ঢাকা-১০ কেন্দ্রের স্বদলীয় সংসদ সদস্য মেজর (অব) মান্নানকে দলত্যাগের পর নিষ্ঠুর নির্যাতনের শিকার এবং তার ঘরবাড়ি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে দিয়ে এমন ভীতির সৃষ্টি করা হয়েছিল যে দলত্যাগে ইচ্ছুক বিএনপির এমপিরা তাতে ভয় পেয়ে গেছেন এবং প্রধানমন্ত্রীর দাওয়াত কবুল করে তার ভোজসভায় গিয়ে তাকে আনুগত্যদানের অঙ্গীকার জানাতে বাধ্য হয়েছেন। যে দৈনিক পত্রিকাটি বিকল্প ধারাকে সমর্থন দিতে এগিয়ে এসেছিল, তার মালিককে নানা সাজানো মামলা–এমনকি একটি বাতিল হয়ে যাওয়া পুরনো ধর্ষণের মামলার আসামী করে জেলে ঢুকিয়ে এমন হয়রান করা হয়েছে, যা কোন সভ্য দেশে কোন গণতান্ত্রিক সরকারের পক্ষে করা সম্ভব নয়।

বাংলাদেশে জোট সরকারের এই বেপরোয়া এবং নির্লজ্জ ত্রাসের শাসন চালানো দেখে দেশের সুশীল সমাজের বড় অংশই আজ হতাশ। তাদের অনেকেই ভাবছেন এই নির্যাতন, হত্যা ও সন্ত্রাসের আর সম্ভবত শেষ নেই। দেশে যখন এই নব্য স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে কোন গণপ্রতিরোধ গড়ে উঠছে না, ডান বা বাম কোন রাজনৈতিক শিবির থেকেই এই দুঃশাসনের বিরুদ্ধে কেউ মাথা তুলছে না– বরং লাঠিবাজি ও সন্ত্রাস দ্বারা শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনগুলোকেও দমন করা হচ্ছে, তখন এই অমানিশার আর বুঝি শেষ নেই। আর বুঝি এই সিন্দবাদের দৈত্য কাঁধ থেকে নামানো যাবে না।

সন্ত্রস্ত ও ভীত গণসমাজের এক বড় অংশের মনের এই শঙ্কা ও ভীতি স্বাভাবিক। তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য বহুদেশের মতো বাংলাদেশের ছাত্র সমাজও ছিল সকল রকম অপশাসন ও দুঃশাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের ভ্যানগার্ড। সকল প্রকার সামাজিক প্রগতির অগ্রদূত। জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় বসার পর অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে এই ছাত্র সমাজের ঐক্য ধ্বংস করে বহুবিভক্ত করেছেন। বড় দলের ঘোষিত লেজুড় করেছেন। তাদের মধ্য থেকে লাইসেন্স পারমিট, টেন্ডার শিকারী, লোভী, দুর্বৃত্ত ও সন্ত্রাসী তৈরি করেছেন। এরশাদ ক্ষমতায় এসে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসগুলোকে ছাত্র নামধারী সন্ত্রাসীদের আড্ডা করে দিয়েছেন। সামরিক গোয়েন্দা সংস্থার মাধ্যমে তাদের কাছে অস্ত্র সরবরাহ করেছেন। ফলে আজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সুশীল ছাত্র সমাজের নয়, ছাত্র নামধারী সন্ত্রাসীদের রাজত্ব। তারা কলম চালানোর বদলে গুলি চালাতে পারদর্শী। ক্ষমতাসীন জোটের আশ্রয়ে ও প্রশ্রয়ে লাল্টু, পল্টু, পিন্টুরাই এখন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে রাজত্ব চালাচ্ছে। এরা মোনায়েম খানের আমলের পাঁচপাণ্ডদের বংশধর।

কিন্তু পাঁচপাণ্ডুকেও একদিন নির্মমভাবে জীবন দিতে হয়েছে। তার গডফাদার মোনায়েম খানেরও স্বাভাবিক মৃত্যু হয়নি। আজ যারা খোয়াব ভবন বা হাওয়া ভবনে বাস করে ভাবেন তারা অজর, অমর, অক্ষয়; তাদের একদিন দিন ফুরুবে। কেমন করে ফুরুবে সেটাই এখন প্রশ্ন। খোয়াব ভবন পুড়ে যাওয়া মাত্র একটি পূর্বাভাস। ছোট ছোট পূর্বাভাস আরও পাওয়া যাচ্ছে। ক্ষমতাসীনেরা তা থেকে সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন মনে করছেন না। কিন্তু যখন তারা সচেতন হবেন, তখন বড় দেরি হয়ে যাবে।

অবস্থা যে পাল্টাচ্ছে তার আভাস তো দিন দিন স্পষ্ট হচ্ছে। ১১ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছ'টি ছাত্র সংগঠনের সম্মিলিত সমাবেশে হামলা চালিয়ে, কয়েক ডজন আহত ছাত্রকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়ে জোট সরকারের কর্তারা ভেবেছিলেন আগের মতোই তারা ডাণ্ডা মেরে সব ঠাণ্ডা করে দিয়েছেন। এবার তা হয়নি। সকল প্রোভোকেশন, প্রলোভন ও গুণ্ডামির মোকাবিলায় সুশীল ছাত্র সমাজের অন্ততঃ ছ'টি সংগঠন সমন্বিত কর্মসূচী নিয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। ১১ তারিখে মার খাওয়ার পর ১২ তারিখে আবার তারা ক্যাম্পাসে জমায়েত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে তারা সভা মিছিল করেছে। পুলিশের বাধা অতিক্রম করে জাতীয় শহীদ মিনারের দিকে শোভাযাত্রা করার চেষ্টা করেছে।

অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতির অফিস তছনছ করা এবং তাকেসহ কয়েকজন শিক্ষকের ওপর হামলা চালানোর হুমকি সৃষ্টির প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা ৭২ ঘণ্টার কর্মবিরতি ঘটিয়ে মৌন মিছিল করেছেন। শহীদ মিনারে সমবেত হয়ে তাদের দাবি জানিয়েছেন। সন্দেহ নেই ঈশান কোণে ক্রমে ক্রমে মেঘ জমছে। এখন তা খণ্ড খণ্ড, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হতে পারে। কিন্তু একদিন জমাট বাঁধবে। হাওয়া ভবনের অধীশ্বরেরা এখনও বুঝতে পারছে না, তারা এক সুপ্ত অগ্নিগিরির উপর বসে আছে। এরা কেউ 'লাস্ট ডেজ অব পম্পেই' এর ইতিহাস পড়েছে কিনা আমি জানি না। পম্পেইর পাশেই ছিল একটি অগ্নিগিরি। শহরের অধিবাসীরা বলতো ওটি মৃত অগ্নিগিরি। ওই পর্বত থেকে কখনও আগুন বেরুবে না। দীর্ঘকাল ধরে এই বিশ্বাস তারা পোষণ করেছে। তারপর সেই মৃত অগ্নিগিরি সহসা একদিন জেগে উঠলো। তারপর?

বাংলাদেশকেও জোট সরকার এবং তাদের চেলাচামুণ্ডারা ভাবছে একটি মৃত আগ্নেয়গিরি। তার জ্বালামুখ থেকে মাঝে মাঝে ধোঁয়া বের হয় বটে, কোনদিন আগুন বেরুবে না। আমাদের সুশীল সমাজেরও একটা বড় অংশের একই বিশ্বাস। সেই বিশ্বাস থেকে তারা ক্রনিক হতাশায় ভুগছেন। আমিও যে হতাশায় না ভুগি তা নয়। কিন্তু আমি ইতিহাসের ছাত্র। তাই ইতিহাস ও মানবতার প্রতি বিশ্বাস হারাই না। চতুর্দশ লুই নাকি একবার বলেছিলেন, অ টর্ব দর্ণ্র্টণ॥আমিই রাষ্ট্র। চতুর্দশ লুই এখন নেই। তার রাষ্ট্রও নেই। আজ যারা বাংলাদেশের ঘাড়ে দৈত্যের মতো জেঁকে বসে ভাবছে, তারাই এই দেশটির শেষ কথা; তারা দু'হাজার বছর আগের পম্পেই নগরীতে বাস করছে। গণ-ভিসুবিয়াসের লাভা-উগীরণ এখনও তারা দেখেনি। 'খোয়াব' পুড়ে যাওয়ার পরেও তাদের শিক্ষা হয়নি। প্রথম মহাযুদ্ধে পরাজিত জার্মানীর রাজা কাইজার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে হিটলারকে বলেছিলেন, "বাপু, ওপথে যেয়ো না। আমি একবার গিয়েছিলাম। আমার

পরিণতি দ্যাখো।" আজ যদি জেনারেল জিয়াউর রহমানের কথা বলার সুযোগ থাকতো, তাহলে হয়তো স্ত্রী ও পুত্রকে ডেকে বলতেন, 'বাপুরা, তোমরা ওপথে যেয়ো না। আমার খণ্ডবিখণ্ড লাশ কি তোমরা চাটগাঁয় জঙ্গলের এক গর্ত থেকে তুলে আনোনি?"

লন্ডন ॥ ১৩ সেপ্টেম্বর সোমবার ॥ ২০০৪

অচলায়তন ভাঙার সূচনা এ ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন

কামাল লোহানী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে গ্রেনেড হামলায় উদ্ভূত রাজনৈতিক পরিস্থিতির মোকাবেলায় সরকারবিরোধী ছয়টি গণতান্ত্রিক ছাত্র সংগঠন ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। ওরা অপরাজেয় বাংলায় প্রথম প্রতিবাদী সমাবেশ ডেকেছিল গত ১১ সেপ্টেম্বর দুপুরে। কিন্তু ক্ষমতাসীন দলের অঙ্গ সংগঠন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল পূর্বাহ্নেই ঘোষণা দিয়ে মাঠে নামে লাঠিসোটা ও ধারাল অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে। দু'জন মাত্র বক্তৃতা করেছে সন্ত্রাস ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে–অমনি সময় অতর্কিতে দস্যুদলের মতন মঞ্চের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ছাত্রদল ক্যাডাররা। লোহার রড, লাঠি, রামদাসহ নানান অস্ত্রে সজ্জিত ছাত্রদল নেতাকর্মীরা প্রতিপক্ষের সমাবেশে অতর্কিত হামলা চালিয়ে অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীদের বেধড়ক মারপিট করে। হাত-পা ভেঙ্গে দেয়। মাথা ফাটায়। এই নারকীয় তাণ্ডবের শিকার আমাদের ছেলেরা ছাড়াও মেয়েরাও হয়েছে। ছাত্রদল ক্যাডাররা মিছিল সহকারে এসেছিল। ফলে প্রাণে বাঁচার জন্য যখন সবাই এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করছিল তখন হীনমানসিকতার ছাত্রদলকর্মীরা তাদের সহপাঠিনীদের সঙ্গেও অশালীন আচরণ করে। নেতাদের মধ্যে ছাত্রলীগ মহানগরের সভাপতি দেলোয়ার হোসেন গুরুতর আহতাবস্থায় হাসপাতালে রয়েছেন। প্রায় অর্ধশত আহত অবস্থায় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে গেলে ছাত্রদল ক্যাডাররা ওখানেও তাদের ওপর চড়াও হয়। পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত ছবি দেখলেই বোঝা যাবে, ছাত্রদল আগের দিন মাঠে নামার ঘোষণা দিয়ে পরের দিন কি জঘন্য-ঘৃণ্য কাণ্ডকারখানাই না করেছে। এ ন্যক্কারজনক ঘটনার পর ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সভাপতি টিভিতে তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে ছয় ছাত্র সংগঠন বিশেষ করে ছাত্রলীগের ওপর দোষ চাপিয়ে বলেছে, এসব সাধারণ ছাত্রছাত্রীরাই নাকি করেছে ছয় সংগঠনের কর্মকাণ্ডে ক্ষিপ্ত হয়ে। 'হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী বাঁধভাঙ্গা বন্যার মতো' ওদের (ছয় সংগঠন) ক্যাম্পাস থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

ছয় সংগঠনের ছাত্রছাত্রী, সমর্থকদের কথা না হয় বুঝলাম, কিন্তু সাংবাদিক, ফটোগ্রাফারদের ওপর আক্রমণ কি কারণে? ওরা সত্য কথা তুলে ধরে। এই সত্যকে যে ওরা ভয় পায়। তাই যাতে না লিখতে পারে বা ছবি না দিতে পারে সেজন্য সব ভেঙ্গেচুরে ফেলতে ওদেরও আঘাত করেছে ছাত্রদল। কিন্তু ওরা জানে না, এতে শারীরিক ও যান্ত্রিকভাবে যে ক্ষতিই হোক না কেন, ওরা কলমসৈনিক, সত্য কথা বলবেই। তাই সব সংবাদপত্রেই যেসব ছবি ছাপা হয়েছে তা দেখলেই সব ধরা পড়ে যায়।

বেশ তো ভাল কথা। ছাত্রদল আত্মরক্ষার জন্যই পাল্টা আক্রমণ চালিয়েছে। সেই আক্রমণের কী বীভৎস চেহারা! ইদানীংকালে বিশ্ববিদ্যালয় এমন পরিস্থিতি মোকাবেলা করেনি। কিন্তু আত্মরক্ষাকারী ছাত্রদের তালাবদ্ধ অধ্যাপকের কামরায় হানা দেয়া এবং সাংবাদিকতা বিভাগের চেয়ারম্যানের কক্ষ ভাংচুর করার কারণ কি? এই অধ্যাপক সর্বজনশ্রদ্ধেয় এবং শিক্ষক হিসাবেও বিপুল জনপ্রিয়। বিপুল ভোটে নির্বাচনে জিতে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি। আআমস আরেফিন সিদ্দিক। ছাত্রদের প্রতি দায়িত্বশীল এবং যে কোন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ও কুৎসিত সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড সক্রিয় রাজপথে এবং ক্যাম্পাসেও। সকল অন্যায় ও সহিংসতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার সাহস তাঁর আছে। সরকারের জঘন্য চক্রান্ত এবং মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক ও যুদ্ধাপরাধী ঘাতক দালালদের পুনরুত্থানের বিরুদ্ধে আরেফিন সিদ্দিক প্রত্যয়-দৃঢ়। তাই মৌলবাদীরা তাঁকে হত্যার হুমকি দেয় আর ছাত্রদল কিংবা শিবির সহচরেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিষ্ক্রিয় পুলিশের সামনে তাঁকে টার্গেট করে কক্ষ তছনছ করে এবং বেয়াদবের মতন শিক্ষকের নাম ধরে খোঁজ করতে থাকে।

সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগ বিভাগের চেয়ারম্যান তখন একাডেমিক কাউন্সিলের বৈঠকে ব্যস্ত ছিলেন। শিক্ষকরা তখন ছাত্রদল ক্যাডারদের দৌরাত্ম্য থামাবার জন্য উপাচার্য বা এমন কোন কর্তৃপক্ষীয় ব্যক্তিকে যোগাযোগে ব্যর্থ হয়ে তাদের এক সহকর্মীর মাধ্যমে উপাচার্যকে বিষয়টি জানালে উপাচার্য অবশ্য তক্ষুণি সেখানে উপস্থিত হন। তিনি তাঁর করণীয় সম্পাদন করেন এবং একটি তদন্ত কমিটিকে এর রিপোর্ট তৈরির দায়িত্ব দেন। শিক্ষক সমিতি এই অনাচার রোধের দাবি জানায় এবং পরবর্তী ৭২ ঘণ্টা কর্মবিরতি ঘোষণা করে। উপাচার্য সাধু কাজ করেছেন কিন্তু কিছু হবে কি? ইতোপূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমাবেশে যেভাবে ছাত্ররাই হামলা চালিয়ে ক্যাম্পাসে কলঙ্কিত ইতিহাস রচনা করেছিল এবং মাইক হাতে যে ছেলেটি নোংরা ও শালীনতা-বিবর্জিত ভাষায় অশ্রাব্য বক্তব্য দিচ্ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের ক্লাস বর্জনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে, সেই ছেলেটি নিজেই ক্লাস করে না অথচ ছাত্র হিসাবে তার নাম রেজিস্ট্রি করে রেখেছে। প্রয়োজনে ক্যাম্পাসে এসে 'ছাত্র' সেজে এইসব কুকীর্তি ঘটায়। সে সময় কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় সবকিছু জানা সত্ত্বেও পরোক্ষভাবে তাকেই সমর্থন করেছিল। ফলে হয়নি কিছুই। বহিরাগত অথবা রেজিস্টারে নাম লেখা অথচ ক্লাস করে না এ ধরনের অছাত্রের সেসব কুকীর্তি চালানো হচ্ছে 'সাধারণ ছাত্র'দের নাম দিয়ে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে আজও ফলপ্রসূ কোন ব্যবস্থাও গ্রহণ করতে পারেনি। এবার আবারও শ্রদ্ধেয় শিক্ষক সম্পর্কে এমন কুৎসিত আচরণের পর সিন্ডিকেটে বহিরাগত ঠেকানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। কিন্তু কিভাবে এটা বাস্তবায়িত করবে কর্তৃপক্ষ? প্রভোস্টদেরও নির্দেশ দেয়া হয়েছে বহিরাগত অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে। তাঁরা নিন্দাও করেছেন এই ঘটনাবলীর। মৌখিক নিন্দাবাদ কিংবা কেবলমাত্র সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং পরের কাঁধে দায়িত্ব চাপিয়ে দিলে সমস্যার সমাধান যে হবে না, তা তো উপাচার্য মহোদয় ভালভাবেই জানেন। এ ব্যাপারে কঠোর মনোভাব নিয়ে উচ্ছৃঙ্খল ছাত্রদের

নিয়ন্ত্রণ করতে শিক্ষক সমিতি, ছাত্র সংগঠন প্রতিনিধি, অভিভাবক প্রতিনিধি, বরেণ্য শিক্ষানুরাগী-সাহিত্যিক, সাংবাদিক, আইনজ্ঞ, চিকিৎসাবিদ, আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার কর্মকর্তাদের নিয়ে সুষ্ঠু বৈঠকের মাধ্যমে বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। সংগ্রামী ছাত্রজোট প্রোক্টরের পদত্যাগ চেয়েছে। সিন্ডিকেট সে সম্পর্কে উচ্চবাচ্য করেনি। করবেও না, এটা জানা কথা। কিন্তু দায়িত্বহীনতারদায় এড়িয়ে যাওয়া এই বিশ্ববিদ্যালয় শাসক কর্তৃপক্ষের কি আদৌ উচিত? এতে তো সমাধান না হয়ে সঙ্কট আরও বাড়ায় বলেই মনে হয়। শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য নিরাপত্তা বাহিনী। অবশ্য আমাদের দেশে তো তার চেহারা ভিন্ন। এরাও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিতে ওস্তাদ।তারপরও এদের ছাড়া তো আর চলে না। ছাত্রজোট এই নিরাপত্তা বাহিনীর একাংশ পুলিশকে ক্যাম্পাস থেকে সরিয়ে নেয়ার প্রস্তাব দিয়েছে। কিন্তু সিন্ডিকেট এ সম্পর্কেও কোন বক্তব্য রাখেনি। তাহলে ছাত্রদের চরমপত্রের প্রধান দুই উপসর্গই বর্তমান রইলই। কি করে এ সব সমস্যার সমাধান হবে? তাই প্রশ্ন জাগে মনে 'উপরের নির্দেশ' আছে নাকি। জানি না। কিন্তু থাকতেই পারে। তাই যদি হয়, ব্যর্থ সরকারের ডিকটেশনে যদি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ উঠবস করে, তবে কি করে সমস্যার হাল হবে? আর এ কারণেই বিশ্ববিদ্যালয়ের চোখে যা অবাধ্যতা (সংগ্রামী ছাত্রজোটের আন্দোলন), তা কিন্তু থেকেই যাচ্ছে বহাল তবিয়তে। আর সে ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের একটা গুরুদায়িত্ব থেকেই যায়। সে ক্ষেত্রে তিনি কি আদৌ কোন স্বাধীন সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন? তাই ক্ষতিপূরণের সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধা করেননি কিন্তু ছাত্রদের দাবির মূল দু'টি সম্পর্কে কোন কথা বলেননি। অথচ আপনারা মিটিং-মিছিল বন্ধ করে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন। কাকে শায়েস্তা করতে এই নিষেধাজ্ঞা জারি করলেন? সংগ্রামী ছাত্রজোট একুশে আগস্টের নারকীয় হত্যাকাণ্ড ঘটানোর পরে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের পথ বেছে নিয়েছে। তারাই মিটিং-মিছিল করছিল। সেটা বন্ধ করে দিল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। কিন্তু যারা পাল্টা মিছিল করে হামলা করছে প্রতিপক্ষের সভা-সমাবেশে তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন না। ফলে তারা প্রশ্রয় এবং পরোক্ষ ইঙ্গিত পেল– ওদের হানা-হামলার পক্ষে। আর সংগ্রামী ছাত্রজোটকে বাধ্য করলেন 'অবাধ্য' হতে। তারা নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেই মিছিল বের করেছে এবং সোমবার পর্যন্ত দাবি পূরণ না হওয়ায় মঙ্গলবার থেকে দেশব্যাপী ছাত্র ধর্মঘটে গেছে তারা। শিক্ষক সমিতিও ক্লাস বর্জনের ৭২ ঘণ্টার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে দোষীদের গ্রেফতার ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কারের দাবি জানিয়েছে। এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ কোন কথাই বলেনি। কিন্তু সমিতি বলেছে, যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দাবি পূরণ না হয় তবে শিক্ষকরা ক্লাস বর্জন ছাড়াও আরও কঠোর কর্মসূচী গ্রহণ করবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকরাও রবিবার মৌন মিছিল করেছেন এবং বাংলা একাডেমী হয়ে শহীদ মিনারে গিয়ে সরব হয়েছেন। বলেছেন ও নিন্দা জ্ঞাপন করেছেন। ওদিকে প্রগতিশীল ছাত্রঐক্যও মিছিল করে অগণতান্ত্রিক নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছে। গোটা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস এখন অচল এবং ভুতুড়ে পরিবেশে ঢাকা। বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন যে পরিবেশ বিরাজ করছে, তাতে মনে হচ্ছে, সরকারের ব্যর্থতা, দুর্নীতি, হত্যাকাণ্ড ইত্যাদি সংঘটনসহ ন্যক্কারজনক দুঃশাসনের সাম্প্রদায়িক ও সহিংস রাজনীতির প্রবর্তন করে দেশবাসীকে এক অগণতান্ত্রিক এবং ভয়াবহ পরিণতির দিকে ঠেলে দিচ্ছে। ফলে অসন্তোষ থেকে যে ক্রোধ জমা হচ্ছে ক্রমশ খুব শীঘ্রই তার বিস্ফোরণ ঘটবে। ঐক্য প্রচেষ্টায় যতই বাধা সৃষ্টির প্রয়াস থাকুক না কেন, মার খেতে খেতে ঐক্যের পথে সকলকেই ভিড়তে হবে, কারণ তা না হলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ রাজনৈতিক কোন শক্তিই জাতির এই চরম মুহূর্তে সাম্রাজ্যবাদী আন্তর্জাতিক চক্রান্ত ও দেশীয় মৌলবাদী আগ্রাসনে রুখে দাঁড়াতে পারবে না।

আওয়ামী লীগও অতীতে এমনই ভূমিকা পালন করেছে, এ অজুহাতে যারা ঐক্যের পতাকাতলে আসতে চাইছেন না, তাঁরা অবশ্যই অনুধাবন করবেন সময়টা এখন অনেকটাই একাত্তরের মতন। নির্দ্বিধায় ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। কিন্তু যদি পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে নতুন যে শক্তি ক্ষমতায় আসবে তাদেরও এই আন্দোলনের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে হবে যে, যদি তারাও বিপথগামী হন, তবে এই সংগ্রাম তাদেরও বিরুদ্ধে সূচিত হবে। আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এ ঘটনা থেকে যে সংগ্রামের সূচনা ঐক্যবদ্ধভাবে, ভবিষ্যতে তাই দুঃশাসনের অচলায়তনকে ভাঙবেই।

বুশ না কেরি?

আমেরিকার লেখক-সাহিত্যিকরা কি ভাবছেন

এনামুল হক

আসছে নবেম্বরে আমেরিকায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। নানা কারণে আজকের আমেরিকা অস্থির ও আলোড়িত। এমনই পটভূমিতে এবারের নির্বাচনের মেজাজ ও আবহটি তাই অন্যান্যবারের নির্বাচন থেকে আলাদা। নির্বাচনে কে জিতবেন–বুশ, না কেরি– সেই চিত্রটি এখনও পর্যন্ত ঘোলাটে। তবে সবাই একবাক্যে স্বীকার করতে প্রস্তুত যে, বহুদিন আমেরিকায় এমন নির্বাচন আসেনি। ভিয়েতনাম যুদ্ধের পর থেকে আমেরিকা প্রজাতন্ত্র এত প্রবলভাবে আলোড়িত আর হয়নি। চলতি নির্বাচনী বছরটিতে গোটা আমেরিকা যেন জ্বলে উঠেছে। আমেরিকানদের আবেগ- অনুভূতি যেন বিস্ফোরিত হবার উপক্রম হয়েছে। এমনকি লেখক-কবি-শিল্পীরাও তার বাইরে নন। এখানে আমেরিকার আগামী অধ্যায় সম্পর্কে ৯ জন মার্কিন লেখক-ঔপন্যাসিকের ভাবনা তুলে ধরা হলো, যাঁরা বিভিন্ন বয়স, সংস্কৃতি, ভাষা, অঞ্চল ও জাতিসত্তার প্রতিনিধিত্বকারী।

কার্ল হিয়াসেন একাধারে সাংবাদিক ও ঔপন্যাসিক। তিনি বুশের শাসনামলকে নিক্সনের ওয়াটার গেট অধ্যায়ের চেয়েও খারাপ বলে মনে করেন। এমন ধারণা আমেরিকার আরও অনেক লেখক-ঔপন্যাসিকেরও। হিয়াসেন বলেন : "একদল দুর্বৃত্ত হোয়াইট হাউস এসে বসবে

এবং সুপ্রীমকোর্টকে, বিচার বিভাগকে, এমনকি কংগ্রেসকেও অগ্রাহ্য করবে এ কথা বিশ্বাসই করা যায় না। সরকারকে হাইজ্যাক করা হয়েছে। এত খারাপ প্রশাসন আমি জীবনে দেখিনি।"

হিয়াসেনের মতে : "এখনকার পরিস্থিতি আগের চেয়ে খারাপ। বুশ প্রশাসনের কিছু কিছু কাণ্ডকারখানার কাছে নিক্সনের কাণ্ডকারখানা তুচ্ছ বলে মনে হবে। নিক্সনের মধ্যে দুর্বৃত্তসুলভ ক্ষুদ্রত্ব ছিল। তিনি সিঁধেল চুরি করেছিলেন, শত্রুর তালিকা বানিয়েছিলেন, রাজনৈতিকভাবে কাদের ঘায়েল করা হবে তার তালিকা বানিয়েছিলেন। তার চেয়েও অনেক খারাপ কাজ করেছেন বুশ। প্রতিদিন লোক মরছে। সর্বশেষ হিসাবে ৯৬২ মার্কিন সৈন্য নিহত হয়েছে। আমরা কি জানি কতজন অসামরিক ইরাকী নিহত হয়েছে? কেউ তার হিসাব রাখে না। আমরা হিসাব রাখি না স্রেফ তারা ইরাকী বলে! এর চেয়ে অশ্লীলতা আর কি হতে পারে!"

হিয়াসেন মনে করেন বুশের বাবা যতটা দক্ষিণপন্থী ছিলেন তার চেয়েও বেশি দক্ষিণপন্থী হলেন বুশ নিজে। এতে এখনকার এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে সংবাদপত্রের ভূমিকা সম্পর্কে হিয়াসেন আশাবাদী নন। তাঁর মতে, "আমেরিকান মিডিয়া অনেক বেশি দায়গ্রস্ত হয়ে পড়েছে। খোঁড়া ও অনুগত হয়ে গেছে। এই মিডিয়াকে সহজেই স্বার্থোদ্ধারে লাগানো যায়। হিয়াসেন মনে করেন আমেরিকান মিডিয়ার সিংহভাগই টিভিচালিত যেমন সিএনএন সিএনবিসি, ফক্স। সবাই আঁকাবাঁকা সর্পিল পথে চলেছে আর দেখছে অন্যরা কি করছে।"

আজকের রাজনৈতিক দৃশ্যপট সম্পর্কে ভাবতে গিয়ে ঔপন্যাসিক পল অস্টার বলেন : "বুশ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নন। তিনি একজন অবৈধ নেতা। আমার মনে হয় ২০০০ সালের নির্বাচন মার্কিন সুপ্রীমকোর্টের অন্যতম বড় ভ্রান্তি হিসাবে ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।" অবশ্য তাঁর এই ভাবনা বাধাগ্রস্ত হয় যখন তাঁর স্মৃতিতে ১১ সেপ্টেম্বরের টুইন টাওয়ার ধ্বংসের দৃশ্য ভেসে ওঠে। ডেমোক্র্যাট সমর্থক এবং "দি নিউইয়র্ক ট্রিলজি" গ্রন্থের প্রণেতা পল অস্টার নিজে এ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। ঘটনাটি তাঁকে এত শোকাহত করেছিল যে, কয়েক মাস পরও তিনি স্বাভাবিক হতে পারেননি। ডেভ এগার্স, ব্রেট ইস্টন এলিস ও রিচার্ড ফোর্ডসহ আরও বেশকিছু লেখকের মতো পল অস্টারও গ্রাউন্ড জিরোর বিভীষিকা নিয়ে কাহিনী লিখতে বাধ্য হন। এ সময়ই অস্টারের কাছে বুশ তাঁর আসল বৈশিষ্ট্য নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। অস্টারের নিজের ভাষায় : "১১ সেপ্টেম্বর একদিকে যেমন ছিল ভয়াবহ ও আতঙ্কদায়ক, অন্যদিকে সেটা আমেরিকার নিজেকে পর্যালোচনা করার এক বিরাট সুযোগ হিসাবেও হাজির হয়েছিল। এবং আমার মতে এ অবস্থায় যে কোন বুদ্ধিমান প্রেসিডেন্ট প্রথমত ফিলিস্তিন ও ইসরাইলের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার সর্বাত্মক চেষ্টা চালাতেন। ১১ সেপ্টেম্বর অন্যদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক পর্যালোচনা করার এবং কেন কিছু লোক এ ধরনের ধ্বংসাত্মক কাজ করতে প্রণোদিত হলো তা অনুধাবন করার সুযোগ এনে দিয়েছে। এদেরকে উন্মাদগ্রস্ত পিশাচ বলে নিন্দা করলেই শুধু হবে না, সেই সঙ্গে বলতে হবে এর পিছনে নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে। কি সেই কারণ সেটাও আমাদের বের করতে হবে।" (চলবে)

❑ সূত্র– দি অবজারভার পত্রিকার "ওয়ানস্ আপন এ টাইম ইন আমেরিকা" শীর্ষক নিবন্ধ

প্রকৃতি ॥ বিশ্বের বড় সন্ত্রাসী

বিকাশ চৌধুরী বড়ুয়া, হল্যান্ড থেকে

আল কায়েদা নয়, নয় বিশ্বের তাবত সন্ত্রাসী সংগঠন, আজকের মানব গোষ্ঠীর সামনে সবচাইতে বড় হুমকি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে যা তা হলো 'মাদার নেচার' বা প্রকৃতি মাতা।

মাদার নেচারকে 'তাবত হুমকির মাতা' হিসাবে বিশ্বের সকল হুমকির ওপর স্থান দিয়ে সম্প্রতি ব্রিটিশ বিজ্ঞানীরা বলেন, কল্পনাতীত জলোচ্ছ্বাস, প্রচণ্ড শক্তিশালী ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরি এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক বিপর্যয় মানব গোষ্ঠী এবং গোটা বিশ্বের জন্য এক মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। অথচ তাঁরা বলেন, বিশ্ব এই ভয়াবহ হুমকিকে এখনও গুরুত্ব দিচ্ছে না, উল্টো একে এক প্রকার উপেক্ষা করে চলেছে। তথাকথিত সন্ত্রাস মোকাবেলার লক্ষ্যে বিশ্বব্যাপী যে তোড়জোড় চলছে তারই পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটিশ রয়েল ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা বিশ্ব সরকারগুলোর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছেন এবং এ ব্যাপারে আরও অর্থ বরাদ্দ করার ওপর জোর দিচ্ছেন বলে চলতি সপ্তাহে ডাচ দৈনিক আলখেমিন দাগব্লাদে প্রকাশিত দীর্ঘ এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।

প্রকৃতির হুমকির ভয়াবহতা দেখাতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা কানারিয়া দ্বীপকুঞ্জের জনপ্রিয় অবকাশ যাপনের দ্বীপ লা পালমার উল্লেখ করে বলেন, এই চমৎকার দ্বীপটি আগ্নেয়গিরির শিকার হলে সমুদ্রের ৫০০ থেকে ১০০০ মিটার গভীরে তলিয়ে যাবে। এটি আজ কিংবা যে কোন মুহূর্তে ঘটতে পারে, ঘটতে পারে ১০০ বছর পরে। কিংবা কখনও নাও ঘটতে পারে। তবে যদি ঘটে, বিজ্ঞানীরা আশঙ্কা করছেন, মাত্র ১৫ মিনিটের মধ্যে ৬৫০ মিটার উঁচু জলোচ্ছ্বাস গোটা মরক্কো ছাপিয়ে যাবে এবং এর এক ঘণ্টা পর স্পেন ও পর্তুগালের উপকূল গ্রাস করে নেবে। জাম্বো জেট গতিসম এই জলোচ্ছ্বাস সাত ঘণ্টা পর যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ উপকূলে গিয়ে পৌঁছবে। সেখানে এই জলোচ্ছ্বাসের আকার হবে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার প্রশস্ত এবং ৫০ মিটার উঁচু, যা প্রায় ২০ কিলোমিটার অভ্যন্তরীণ এলাকা ধ্বংস করবে। মায়ামি ছাড়াও ব্রাজিলের উত্তর উপকূলীয় এলাকাও এই ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রেহাই পাবে না বলে বিজ্ঞানীরা উল্লেখ করেন।

এই ধরনের ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের মুখোমুখি হবার সম্ভাবনা মাত্র ০.৭% হলেও তা গোটা সন্ত্রাসী আক্রমণের ঝুঁকির চাইতেও অনেক বেশি। বিজ্ঞানীরা কিসের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন তা পরিষ্কার নয়। তবে তাঁরা বলেন, এই জাতীয় ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ দশ হাজার বছরে একবার ঘটার সম্ভাবনা।

এই জাতীয় 'ডুমস্ ডে'র বা 'রোজ কেয়ামতের' দিনের চিত্র গত ২০০০ সাল থেকে বিজ্ঞানীরা বিশ্বব্যাপী জনসমক্ষে তুলে ধরছেন। এর পেছনে যে দু'জন বিজ্ঞানী কাজ করে চলেছেন তাঁরা হলেন লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাকৃতিক দুর্যোগ অনুসন্ধান সেন্টারের আগ্নেয়গিরি বিষয়ক ব্রিটিশ বিশেষজ্ঞ ড. সিমন ডে এবং অধ্যাপক বিল ম্যাকগায়ার। প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষতির একটি চিত্র তুলে ধরে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, ১৯৪৯ সালে লা পালমা দ্বীপে আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ ঘটলে গোটা দ্বীপের সাত ভাগের পাঁচ ভাগ তলিয়ে যায় এবং সে অবধি প্রতি বছর দ্বীপটি এক সেন্টিমিটার করে নিচের দিকে দেবে যাচ্ছে। ১৯৯৮ সালে নিউগিনিতে অনুরূপ প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রাণহানি ঘটে ২০০০ লোকের। ১৮৮৩ সালে ইন্দোনেশিয়ার আগ্নেয়গিরির দ্বীপ হিসাবে পরিচিত ক্রাকাতু দ্বীপে বিস্ফোরণ ঘটলে এর শব্দ ৫০০০ কিলোমিটার পর্যন্ত শোনা যায়। এতে সুমাত্রা ও জাভায় ৩৬০০০ লোকের প্রাণহানি ঘটে।

বিজ্ঞানীদের মতে, বিশ্বে বর্তমানে প্রায় কয়েক হাজার ভয়াবহ আগ্নেয়গিরি সুপ্ত অবস্থায় রয়েছে, যা যে কোন মুহূর্তে বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। কিন্তু অর্থের অভাবে মাত্র এক শ' আগ্নেয়গিরির ওপর নজর রাখা সম্ভব হচ্ছে। এমন চলতে দেয়া হলে হয়ত একদিন দেখা যাবে 'মাদার নেচার' মাতৃরূপে না এসে সন্ত্রাসী রূপ ধরে হাজির হবে মানব গোষ্ঠীর সামনে।

কানারিয়া দ্বীপকুঞ্জের লা পালমা দ্বীপের আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ ঘটলে যে ভয়াবহ ক্ষতি হবে তাই দেখানো হয়েছে ছবিতে। নিচে বামদিক থেকে ক্রমিকানুসারে ১ ঘণ্টা পর আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল ছাপিয়ে যাবে জলোচ্ছ্বাস। ২ ঘণ্টা পর স্পেন, পর্তুগাল, ফ্রান্স হবে আক্রান্ত। ৬ ঘণ্টা পর দক্ষিণ আমেরিকার উপকূল। ৯ ঘণ্টা পর যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা হবে আক্রান্ত।